আজকের কাগজ
15
তারিখ ... 03 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ৪
উৎস-পরিণতি প্রতিকার

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

-পূর্ব প্রকাশের পর

. সুলতান-মুস্তাক তৎকালীন সময়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন অপরদিকে দুদু-রিপন, ছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একক মনোনীত প্রার্থী। সাধারণ ছাত্রদের ভোটে সুলতান-মুস্তাক এই ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলেও পরের দিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে ন্যাক্কারজনক আক্রমণ ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র রাজনীতির সর্বাপেক্ষা হতাশা ও লজ্জাজনক সন্ত্রাসী বলে আমি মনে করি। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ-এর অন্তর্ভুক্ত ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সম্ভ্রমহানির এক নজিরবিহীন সন্ত্রাস সংঘটিত হতে দেখি, সেই সন্ত্রাসে বহু ছাত্রী বোনেরা "সম্ভ্রমহানি সন্ত্রাস"-এর শিকারে পরিণত হন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক সৃষ্ট এই নব্যমাত্রার সন্ত্রাস আজো সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে খ্যাত। দুপুরের দিকে এ সম্ভ্রমহানি সন্ত্রাস-এর প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ-এর কর্মীরা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী ভূমিকার প্রস্তুতিকালে মধ্যাহ্নে মধুর ক্যান্টিন সম্মুখে দ্বিতীয় সন্ত্রাস-এর শিকারে পরিণত হয়। সেই সন্ত্রাসী রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের বিজয় মিছিলে যোগ দিতে আসা জাসদ ইনু সমর্থক ও কর্মী কনক নামের তারুণ্য গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। বিজয় মিছিল সেদিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সৃষ্ট সন্ত্রাসে শব যাত্রায় পরিণত হতে দেখেছি।

এই হত্যাকাণ্ড ও ছাত্রী মিছিলে আক্রমণের পর ডাকসুর নির্বাচিত সুলতান-মুস্তাক পরিষদ-এর বিপক্ষে কোন প্রকার কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ কেন করেনি এর জবাব একমাত্র তারা দিতে পারবেন। সদ্য নির্বাচিত ডাকসুর কাছ থেকে এইরূপ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার ভূমিকা সত্যিকারার্থে আজো রহস্যময়। নির্বিকার এই ভূমিকার কারণে পরবর্তী নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলো ঐ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কাছে পরাজিত হন। ছাত্রীরা NEGATIVE ভূমিকার প্রতিউত্তর বোধ হয় পরবর্তীতে এভাবেই দিয়েছিলেন। আমার ছাত্র রাজনৈতিক সময়কালে এটা একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

ছাত্রী মিছিলে হামলা হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমন একটি ঘটনারও তদন্ত রিপোর্ট আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। কেন এই ব্যর্থতা তার জবাবও প্রশাসনই একামাত্র দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতভাবে বলতে গেলে এটা আমার কাছে আজো বোধগম্য নয়।

১৯৯০ সালে ছাত্র রাজনীতি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলো। ছাত্র রাজনীতিতে এরশাদীয় পেটোয়া বাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যারা অনিবার্যভাবে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সাধারণ ছাত্রদের সংঘটিত করে জেনারেল এরশাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এদের সাহসী প্রচেষ্টার কারণে '৯০-এর অভ্যুত্থান সফল হতে পেরেছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলেও সত্যি যে '৯০ পরবর্তীতে ঐ আন্দোলনের সুফল ভোগকারী সরকার আসার পর উক্ত যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই নিজদল কর্তৃক নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত ও বঞ্চিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ের সাহসী তারুণ্যরা পরবর্তীতে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন- এ যেন "বুমেরাং প্রক্রিয়া"।

অসীম সাহসী এই যোদ্ধাদের মধ্যে দেখেছি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মনিরুজ্জামান বাদল, মঈনুদ্দিন, ইউসুফ, মাসুম আহম্মেদ, মোয়াজ্জেম, এমদাদ, রাজীব, মোহাম্মদ আলী, টোকন, পল অশ্রু, বাবু, সাব্বির, জাহাঙ্গীর, রিপন, মালা, লিও, বিশ্বজিৎ, রানা, আবীর, শামীম, ও আরো অনেকে। জাসদ ইনু সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অকাল প্রয়াত আবু হাসান মুরাদ, মোতাহার, শামীম, চুন্নু-এর ভূমিকা সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য।

এটা দুঃখজনক সত্য যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে বিভিন্ন রকম জীবন-যাপন করছেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত জীবনে এক ধরনের হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, কেউবা মৃত্যুর ওপারে, কেউ কেউ কারাবাসে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক দল কর্তৃক আজ বহিষ্কৃত কিংবা রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। খুব কম সংখ্যক তৎকালীন ছাত্র-তারুণ্যরা আজ রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে আরো উল্লেখ্য, তিনটি বিষয় বিশ্লেষণের দাবি রাখে, ১৯৯০ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন অস্ত্র জমা দানের লক্ষ্যে একটি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাহসী তরুণ '৯০ আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা যিনি এরশাদ-এর পেটোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, সাধারণ ক্ষমার আওতায় তিনি পরবর্তীতে অস্ত্র জমা দিয়েও সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অস্ত্র জমাদানের এটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি সরকার বিরোধী ভূমিকা রাখার জন্যে বিনা বিচারে আজো ডিটেনশন অবস্থায় কারাবাসে দিন কাটাচ্ছেন। এই রাজনৈতিক কর্মীটির নাম মোহাম্মদ আলী।

অপর আর একজনের নাম বিশেষভাবে উচ্চারণযোগ্য, যার নাম আবু হাসান মুরাদ। সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে যার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিলো, তিনি জাসদ ইনু সমর্থিত ছাত্রলীগের সংগঠক ছিলেন। ১৯৯০ আন্দোলনে তার ভূমিকা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজ দল কর্তৃক পরবর্তীতে কোণঠাসা হলেও যিনি রাজনীতি থেকে ফিরে আসেননি বরং নানান সময় ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন বর্তমান সরকারের আমলে তিনি একবার গ্রেফতারও হয়েছিলেন। অথচ মুরাদের মতন এই উজ্জ্বল তারুণ্য রাতের অন্ধকারে তার বাড়ির সম্মুখে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এই সাহসী তরুণের প্রকৃত হত্যাকারীকে আজো চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একজনের কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। ১৯৯০ এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের আর এক সৈনিক হলেন ইলিয়াস আলী। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষে অনেক সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়কালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পরও নিজ ছাত্র সংগঠনের কর্মী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বর্তমানে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইলিয়াস আলীর নিজস্ব মত অনুসারে তিনি দাবি করেন যে, "নিজ দল কর্তৃক তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার।"

অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতিতে অনিবার্য সন্ত্রাসের ফলশ্রুতিতে নিহত হয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। ১৯৯২ সালের ৯ই জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী চলাকালে আমার এককালীন ছাত্ররাজনীতিতে সংগঠনের সহযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধুর অকুতোভয় সৈনিক এবং রাজনীতিতে যিনি মাঠ থেকে বেড়ে উঠেছিলেন সেই বাদলের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই আমার সংগঠনের অনেক নির্দোষ ত্যাগী কর্মী ও নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। নির্দোষ ব্যক্তিও ষড়যন্ত্রের কারণে বাদল হত্যাকাণ্ডের মিথ্যে আসামী হয়েছেন। যেটা স্বাভাবিকভাবে আমার দৃষ্টিতে দুঃখজনক। মনিরুজ্জামান বাদল তারই সহযোদ্ধা প্রতিপক্ষদের হাতেই নিহত হয়েছেন বলে প্রকাশ। এ ব্যাপারে কোন যুক্তি-তর্ক, দোষ-নির্দোষের মধ্যে না গিয়ে বলবো সংগঠনের মধ্যে এমন পরিস্থিতি কেন বা কিভাবে সৃষ্টি হলো, যাতে করে বাদলের মতো ত্যাগী নেতাও নিহত হলেন। আর বাদলের লাশ নিয়ে খেললেন তদানীন্তন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাদল নিহত হবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির কোন মিটিং ছাড়াই ছাত্রলীগের তদানীন্তন নেতৃত্ব ছাত্রলীগের মধ্যে প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের অনেককে ব্যক্তিগত রোষের কারণে বহিষ্কার করেন বাদল হত্যাকাণ্ডকে জড়িত করে। এ ব্যাপারে একটি বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আমার ভবিষ্যতে আছে।

সন্ত্রাসী ঘটনার কথা আসতে একটি চকচকে উজ্জ্বল ছেলের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল তরুণ ব্যক্তিত্ব চুন্নু। এই চুন্নু আমার সম্মুখেই গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। আর এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুটা পেছনের দিকে আসতে হয়। চুন্নুর নিহত হবার সময়টি ছিলো ফেব্রুয়ারি, আমলটা এরশাদীয় এবং সেই সময় একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ছবি টানানো ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সন্ত্রাস চলতো। এমনি একটি একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিএনপি'র প্রধান ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। শহীদ মিনারে ছবি টানানো ঘটনায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে চরম উত্তেজনা, পরবর্তীকালে এই উত্তেজনা সন্ত্রাসে রূপ নেয় এবং সে কারণে খালেদা জিয়া শহীদ বেদিতে ফুল না দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে যান।

পরের দিন এই ঘটনার ভিত্তিতে সকাল থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রলীগ নেতা ও ছাত্রদল নেতারা সেদিন মধুর ক্যান্টিনে দু'টি টেবিলে অবস্থান করেছিলেন। আমার জানামতে সেদিন অন্য কোন সংগঠনের নেতাদের মধুর ক্যান্টিনে দেখা যায়নি। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বিবদমান ঘটনা পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিয়েছিলো। মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের টেবিলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের হামলায় দখলের খবর জহুরুল হক হলে পৌঁছলে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা রাস্তায় নামলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুলিশ এই সময় প্রচুর টিয়ার সেল ছুঁড়েছিলো যা হলের ভেতর থাকাকালে অসহনীয় ছিল। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আমি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। বাইরের রাস্তায় তখন চলছিলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। পুলিশও সেদিন মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিলো, সেই সময় এরশাদ আমল হলেও পুলিশকে কেন জানি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষে ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিপক্ষে ভূমিকা রাখতে দেখেছি। জানি না এটা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশে সংঘটিত হয়েছিলো।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বা সামরিক সন্ত্রাস প্রতিটি ক্ষেত্রে নিহত বা খুন করার অভিন্ন সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই হত্যাকাণ্ডগুলো আজও সংঘটিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে হয়তো। কিন্তু হত্যাকাণ্ডগুলোর কোন কোনটি দায়সারা গোছের বিচার, কোনটি বিনা বিচারে থেকে যায়, এর ফলে প্রকৃত রহস্য, উৎস ও কারণ কোন কিছুই উদ্ধার হয়নি। তদন্ত কমিটি করেই ঢেকে দেয়া হয়েছে, সকল নষ্ট উদ্দেশের প্রকৃত কার্যকরণ। এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঐ সকল তদন্ত কমিটি সমূহকে খুঁজে বের করার জন্য আর একটি তদন্ত কমিশন আজ জরুরী প্রয়োজন।

পরবর্তী কিস্তি ৬ মে

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।